হজ-উমরাহ বিশ্বকোষ

মানচিত্র, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিধিবিধান

সামি ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ আল-মাঘলুস

SEAN
PUBLICATION

মহান আল্লাহর নামে
যিনি পরম করুণাময়, মহা দয়ালু

হজ-উমরাহ বিশ্বকোষ

মানচিত্র, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিধিবিধান

সামি ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ আল-মাঘলুস

ভাষান্তর
আশরাফুল হক

নিরীক্ষণ
আসলাফ একাডেমি
www.aslafacademy.com

গ্রাফিক্স ও পৃষ্ঠাসজ্জা
ফেরদাউস মিকদাদ
ইসমাঈল মারুফ, শরিফুল ইসলাম,
তাসনিমুল হাসান, খালেদ হাসান খান

বানান, ভাষারীতি ও সহসম্পাদনা
ইমতিয়াজ উদ্দীন খান, ওমর আলী আশরাফ,
নূর মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ, আবদুর রহমান রাফি

সম্পাদনা ও নির্দেশনা
আবু তাসমিয়া আহমদ রফিক

SEEN
PUBLICATION

সূচিপত্র

লেখকের কথা

প্রথম পর্ব: মক্কা মুকাররামা; মানচিত্র, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পবিত্র স্থানসমূহ ১১

অধ্যায়-১

ইবরাহিম ﷺ-এর পূর্বে যেমন ছিল হজ ১৩

অধ্যায়-২

ইবরাহিম ﷺ-এর হিজরত, কাবা নির্মাণ ও হজের আহ্বান ৩৭

অধ্যায়-৩

নবিজির সময়কাল এবং তাঁর শেখানো হজের পদ্ধতি ৯৭

অধ্যায়-৪

ইসলামের সূচনাকাল থেকে মামলুক যুগের শেষ পর্যন্ত হজ কার্যক্রম ১১৩

অধ্যায়-৫

প্রাচীন ও আধুনিক যুগের শুরুর দিকের হজের প্রসিদ্ধ পথসমূহ ১৩২

অধ্যায়-৬

বৈশ্বিক ও ইসলামি ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে হজ ১৫৯

অধ্যায়-৭

তুর্কি-উসমানি শাসনামলে হজ ১৭০

অধ্যায়-৮

সৌদি যুগে হজ ১৮৩

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

দ্বিতীয় পর্ব: মদিনা মুনাওয়ারা

রাসুলের হিজরত; মানচিত্র, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পবিত্র স্থানসমূহ ২৪৮

অধ্যায়-১

মদিনা মুনাওয়ারার ভৌগোলিক অবস্থান ২৫১

অধ্যায়-২

মসজিদে নববি: ঐতিহাসিক সংস্কার ও সম্প্রসারণ, প্রেক্ষাপট এবং ইতিহাস ২৮১

অধ্যায়-৩

মসজিদে নববির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ২৯৩

অধ্যায়-৪

মদিনা মুনাওয়ারার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মসজিদসমূহ ৩১১

অধ্যায়-৫

মদিনার ঐতিহ্যবাহী কিছু নিদর্শন ৩২৫

তৃতীয় পর্ব: হজ ও উমরাহর মাসায়েল, নিয়ম কানুন ও বিধিবিধান ৩৪৮

গ্রন্থপঞ্জি: প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব (ইতিহাস) ৪০৫

গ্রন্থপঞ্জি: তৃতীয় পর্ব (ফিকহ) ৪০৯

বিশ্বকোষের লেখক ও ডিজাইনারের জীবন-পরিচিতি ৪১২

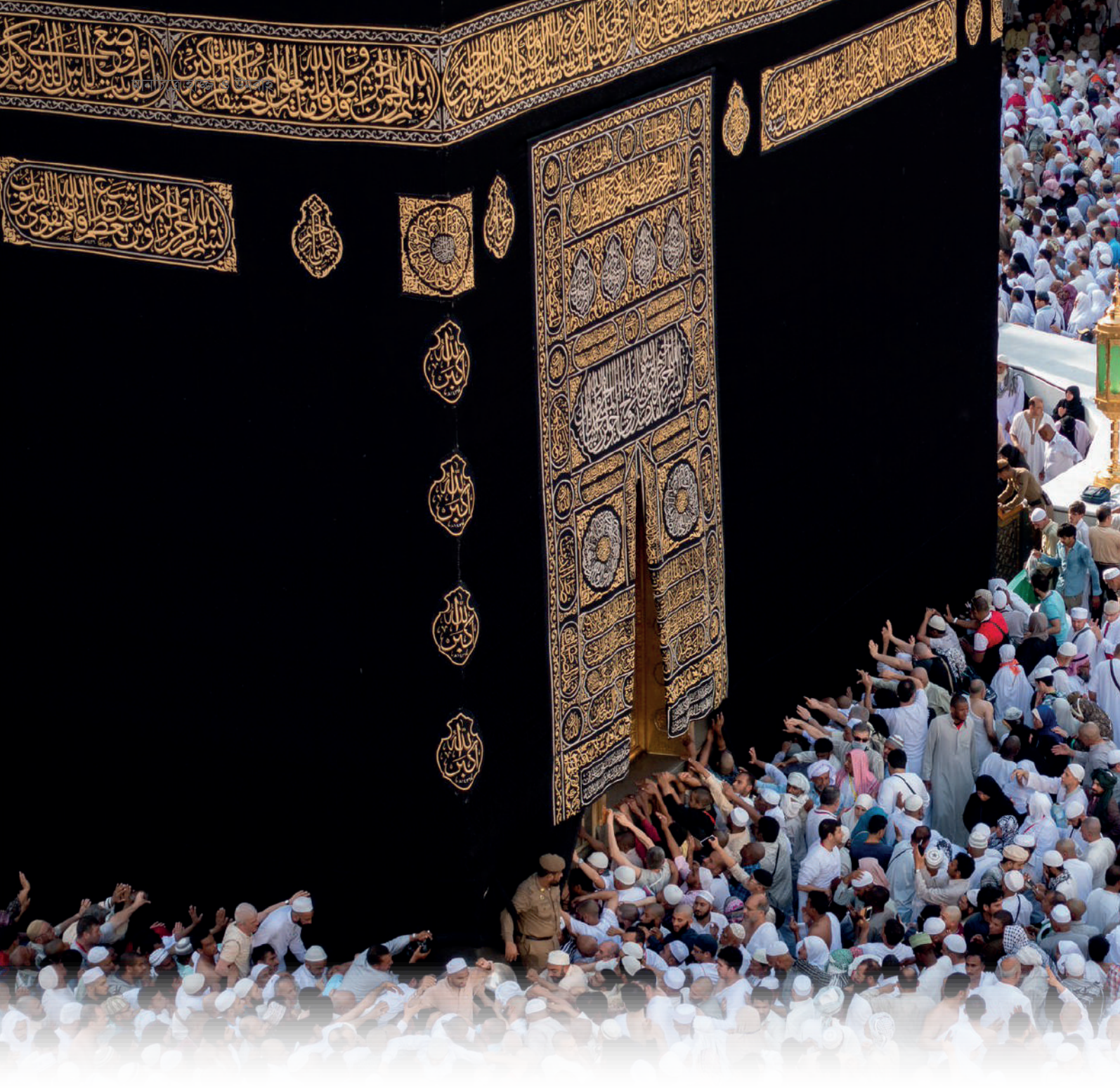

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْك

আমি হাজির! হে আল্লাহ, আমি হাজির!

পবিত্র কাবার নির্মাণগল্প

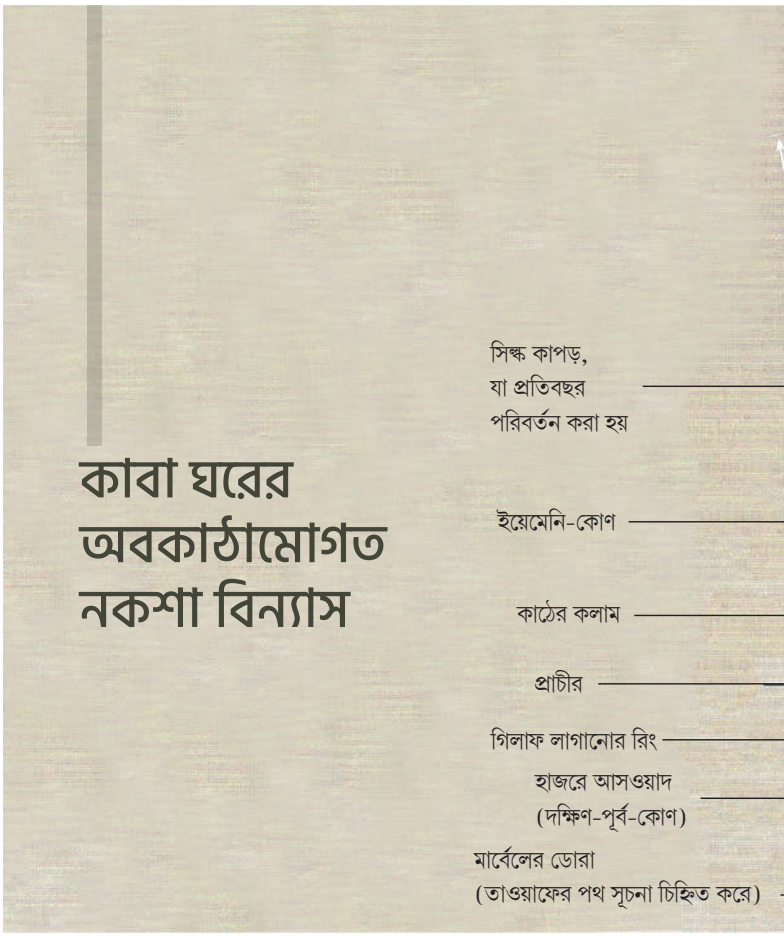

আল্লাহ ﷻ বলেন,

﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَـٰلَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ ءَايَـٰتٌۢ بَيِّنَـٰتٌ مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَـٰلَمِينَ ﴾

‘নিঃসন্দেহে প্রথম গৃহ—মানুষের (ইবাদতের) জন্য যা নির্মিত হয়েছে, যা বাক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হিদায়াত ও বরকতময়। তাতে রয়েছে মাকামে ইবরাহিমের মতো সুস্পষ্ট নিদর্শন। যে-কেউ সেখানে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। আর প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে ওই ঘরের হজ করা ফরজ। আর যে-কেউ তা প্রত্যাখ্যান করল, তার জানা উচিত—নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগৎ থেকে অমুখাপেক্ষী’ (আল-কুরআন ৩: ৯৬-৯৭)।

এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ স্পষ্টভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, আল্লাহর ইবাদতের জন্য পৃথিবীর বুকে নির্মিত প্রথম মসজিদ মক্কায় অবস্থিত। যেটি সম্মান ও মর্যাদায় অনন্য, যাকে আবেষ্টন করে আছে মানবজাতির ইতিহাস, অসংখ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাবলি। এখানে আরও আছে মাকামে ইবরাহিম। আল্লাহ এই স্থানকে পছন্দ করেছেন এবং পৃথিবীর অন্য সব স্থানের চেয়ে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। এই ভূমিতে রক্তপাত নিষিদ্ধ। এখানে কোনো গাছ কাটা যাবে না। শিকার করতেও বারণ করা হয়েছে। কাবা হলো পুরো পৃথিবীর মানুষের জন্য কিবলা, আর কিবলার দিকে ফিরে মলমূত্র ত্যাগ করতেও নিষেধ করা হয়েছে।

ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত, আদম عليه السلام-কে যখন জান্নাত থেকে দুনিয়ায় পাঠানো হলো, আল্লাহ তাকে বললেন—‘হে আদম, আমার জন্য পৃথিবীতে একটি ঘর তৈরি করো। সেখানে তাওয়াফ করো এবং আমার নামের জিকির করো, যেভাবে আমার আরশকে ঘিরে ফেরেশতাদের করতে দেখেছ।’ আদম عليه السلام চলতে আরম্ভ করলেন, পৃথিবী তার জন্য ভাঁজ হয়ে এলো, দীর্ঘ পথ যেন সংক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তিনি যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই গড়ে উঠেছিল জনবসতি; এভাবে কাবা নির্মাণের জায়গায় পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত তিনি চলতে লাগলেন। এরপর জিবরিল عليه السلام এসে তার ডানা দিয়ে মাটিতে সজোরে আঘাত করলেন। মাটি চিরে দেখা গেল একটি শক্ত ভিত, যা মাটির সপ্তম স্তর পর্যন্ত প্রোথিত। ফেরেশতারা আদম عليه السلام-কে এমন ভারী পাথর দিলেন, যা ত্রিশজন মানুষের পক্ষেও ওঠানো সম্ভব নয়। এরপর তিনি কাবাগৃহ

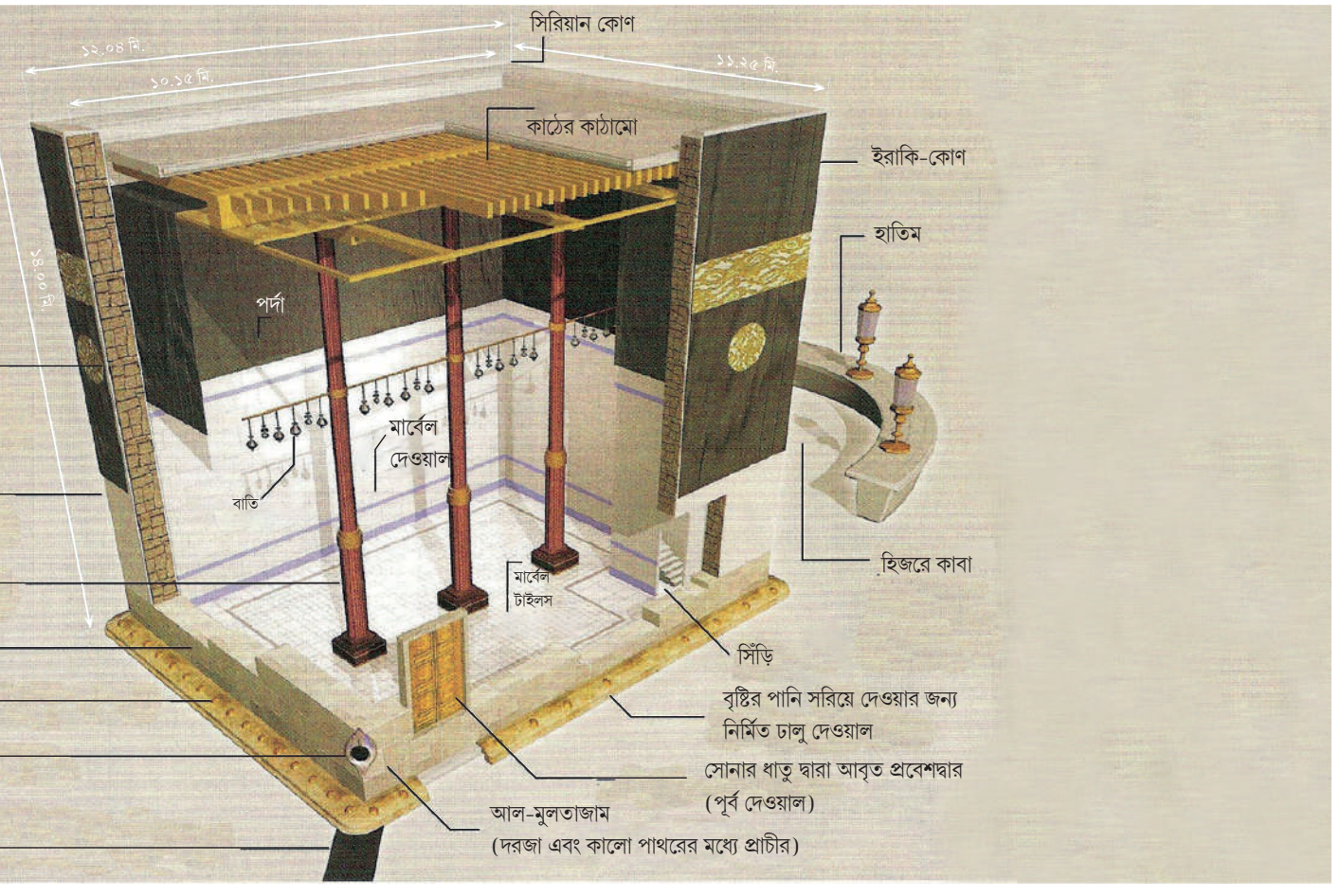

নির্মাণ করলেন পাঁচটি পাহাড় (হেরা, সিনাই পর্বত, লুবনান পর্বত, জুদি এবং তুর) থেকে আনা পাথর দিয়ে; আর হেরা থেকে আনা পাথরের ওপর কাবার মূল ভিত্তি নির্মিত হয়েছিল।

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে—আল্লাহ ﷻ আদম ﷺ-কে জান্নাতের একটা তাঁবু দিয়েছিলেন, যা কাবা ঘরের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত স্থানে টাঙানো হয়েছিল। তিনি সে তাঁবুতে থাকতেন এবং সেটিকে তাওয়াফ করতেন। তাঁবুটি আদম ﷺ-এর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে ছিল। তার মৃত্যুর পর তাঁবুটি তুলে নেওয়া হয়। এই বর্ণনা ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহের।

আরেক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ ﷻ আদম ﷺ-কে একটা ঘরসহ পাঠিয়েছিলেন, যেটি তিনি তাওয়াফ করতেন; তার মুমিন বংশধরগণও এই ঘর তাওয়াফ করত। নুহ ﷺ-এর যুগে মহাপ্লাবনের সময় আল্লাহ ঘরটি আসমানে উঠিয়ে নেন, এবং এই ঘরকেই বলা হয় বাইতুল মামুর। এটা বর্ণনা করেছেন কাতাদা ﷺ এবং আল-হালিমি *মিনহাজুদ দীন* কিতাবে তা উল্লেখ করেছেন। কাতাদার বর্ণনা উদ্ধৃত করার পর আল-হালিমি লিখেছেন, 'আদম ﷺ-কে একটা ঘরসহ পাঠিয়েছিলেন' বলে কাতাদা হয়তো বোঝাতে চেয়েছেন—আদম ﷺ-কে বাইতুল মামুরের মাপ অর্থাৎ এর উচ্চতা, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ পাঠানো হয়েছে এবং সেই মাপে বাইতুল মামুর বরাবর নিচে একটি ঘর বানানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর তাঁবুর বিষয়টি হলো—আদম ﷺ-এর কাছে একটি তাঁবু পাঠানো হয়েছিল এবং সেটি কাবা ঘরের জায়গাতেই স্থাপন করা হয়। এরপর আল্লাহ তাকে কাবা ঘর নির্মাণের আদেশ দিলে তিনি নির্মাণকাজ সম্পন্ন করেন। আর স্বাভাবিক কারণেই তাঁবুটি রয়ে যায় কাবার পাশে। আদম ﷺ যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনি এই তাঁবুতে ছিলেন। এটি ছিল তার বিশ্রামের জায়গা। এরপর আদম ﷺ-এর মৃত্যুর পর তাঁবুটি উঠিয়ে নেওয়া হয়।

এ বর্ণনাগুলো থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে, আদম ﷺ প্রথম কাবা নির্মাণ করেন এবং ইবরাহিম ﷺ সেটার পুনর্নির্মাণ করেন।[1] এ বিষয়ে আমরা পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।

[১] আল-কুরতুবি, আবু আবদুল্লাহ, শামসুদ্দিন মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আল-আনসারি, *তাফসির আল-কুরতুবি*, খণ্ড ২, পৃ. ১২১

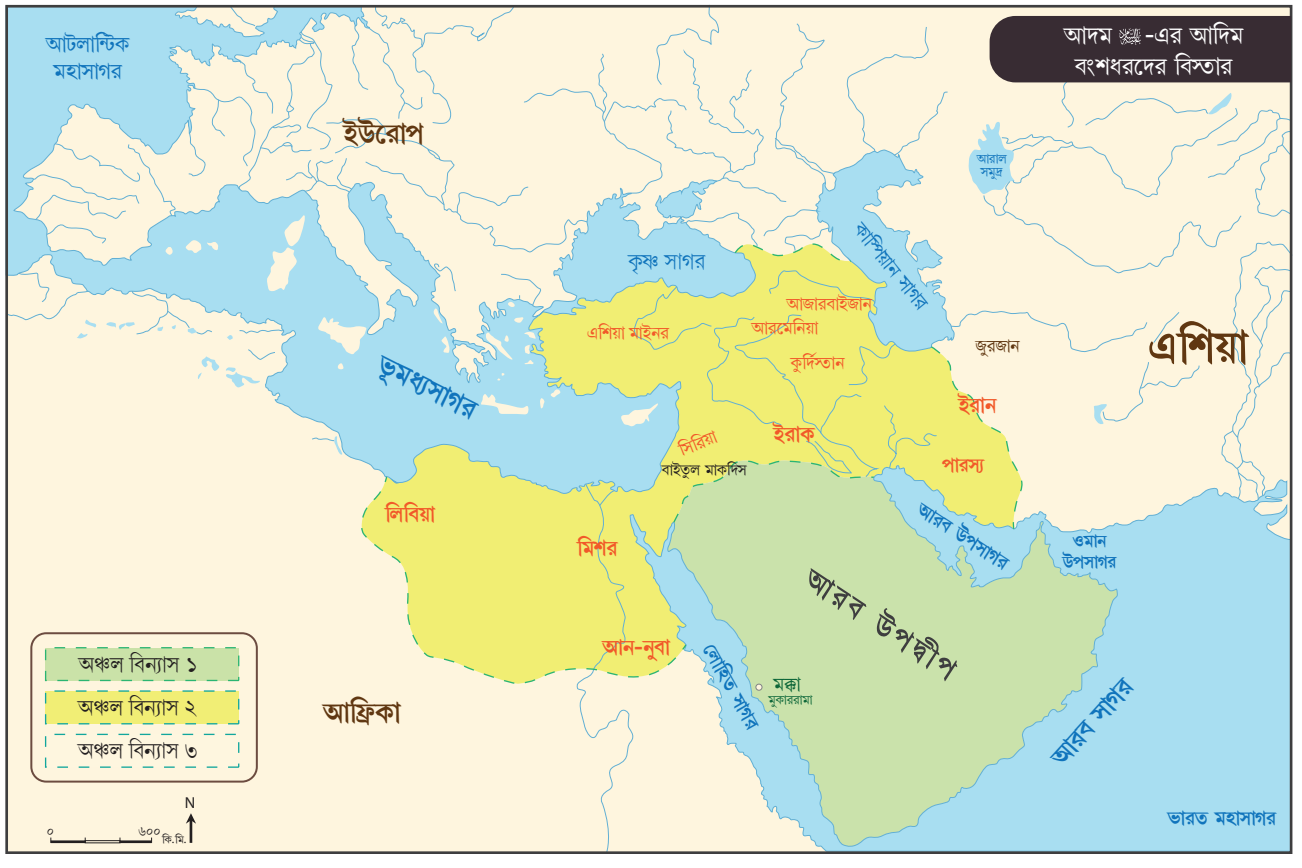

উসফান উপত্যকা

নবি-রাসুলদের হজ-রুট

ইবনু আব্বাস ﷺ বলেন,

لَمَّا مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَ سَلَّمَ بِوَادِى عُسْفَانَ حِيْنَ حَجَّ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَيُّ وَادٍ هَذَا؟ قَالَ : وَادِى عُسْفَانَ قَالَ: لَقَدْ مَرَّ بِهِ هُودٌ وَ صَالِحٌ عَلَى بَكَرَاتٍ (١) حُمْرٍ خُطُمُهَا اللِّيْفُ أُزُرُهُمْ الْعَبَاءُ وَ أَرْدِيَتُهُمْ النِّمَارُ (٢) يُلَبُّوْنَ يَحُجُّوْنَ الْبَيْتَ الْعَتِيْقَ.

‘যখন হজের সময় রাসুল ﷺ উসফান উপত্যকা অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকর, এটা কোন উপত্যকা? আবু বকর ﷺ বললেন, এটা উসফান উপত্যকা। নবিজি তখন বললেন, হুদ ও সালেহ ﷺ লাল উটে চড়ে এই উপত্যকা অতিক্রম করেছিলেন। উটের লাগাম ছিল খেজুরগাছের বাকলের তৈরি এবং তারা উভয়ে ছিলেন ঢিলেঢালা দাগ পড়া জামা পরিহিত। তালবিয়া জপতে জপতে তারা প্রাচীন গৃহে (বাইতুল্লাহ) হজ করেছিলেন’ (*মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বল*, হাদিস: ২০৬৭)।

দ্বিতীয় পর্ব

মদিনা মুনাওয়ারা

রাসুলের হিজরত

মানচিত্র, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পবিত্র স্থানসমূহ

অবতরণিকা

মদিনা, 'মাদিনাতুন নাবি' বা নবিজির শহর।

নবিজির বরকতময় হিজরতের আগে এই শহরের নাম ছিল ইয়াসরিব। এটি খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর কথা। তখন সেখানে বসবাস করত ইহুদিরা। ফিলিস্তিনে রোমকরা তাদের ওপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল, সেই নির্যাতনের ক্ষত গায়ে নিয়েই তারা ইয়াসরিবে বসবাস করতে শুরু করে। ইয়াসরিবে তারা তাদের স্বাভাবিক ধর্মকর্মের চর্চা বেশ গুরুত্বের সাথে ধরে রেখেছিল। প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা হিসেবে তারা যদিও আরবিকে বেছে নিয়েছিল, কিন্তু ধর্মীয় আচারপ্রথা পালন করত হিব্রু ভাষায়।

ইয়াসরিবের মাটিতে তখন নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের মূলে ছিল দুটি গোত্র—আওস ও খাজরাজ। ইহুদিরা এসে ইয়াসরিবের এদিক-ওদিক, আওস ও খাজরাজের গোত্র-উপগোত্রসমূহের আশেপাশে বসবাস করতে থাকে। সেসময় আওস ও খাজরাজের ধর্মবিশ্বাস ছিল পৌত্তলিকতা; পূজার বেদিতে সটান দাঁড়িয়েছিল কতগুলো আস্ত মূর্তি। আওস-খাজরাজ তাদের হৃদয়ের গভীরে মূর্তির প্রতি প্রবল ভালোবাসা ও ভক্তি লালন করত। তারা এই মূর্তির ইবাদত করত। জীবন যাপনের অবলম্বন হিসেবে তারা উৎপাদন করত নানা প্রকারের শস্য, ফসলাদি, ফলমূল। নিজস্ব উৎপাদনের ওপর ভরসা করেই স্বনির্ভর হচ্ছিল তারা। ওদিকে ইহুদিরা তাদের জীবিকা নির্বাহ করত শিল্পকর্ম ও কারিগরি দক্ষতার ওপর; বিশেষত অস্ত্রশিল্প ছিল তাদের প্রধান অবলম্বন।

আওস ও খাজরাজ বসবাস করত দুর্গরক্ষিত শহরে। তবে শহরে বসবাস করলেও তাদের জীবনপ্রবাহ অনেক ক্ষেত্রে যাযাবর ও বেদুইনদের সাথে মিল ছিল। বেদুইনদের মতো তারাও পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহে মেতে থাকত এবং কুচক্রী ইহুদিমহল সেই যুদ্ধের আগুনে ঘি ঢালত। আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়কে নিজেদের মধ্যে এ যুদ্ধ অব্যাহত রাখার ব্যাপারে ইহুদিরা বিভিন্নভাবে উস্কানি দিত। ইহুদিদের এই ইন্ধনেই তাদের মধ্যে 'বুয়াস'-এর মতো নানা যুদ্ধ-সংঘাত দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাদের জীবন ছেয়ে গিয়েছিল রক্তক্ষয়ী এক সংঘর্ষের বিভীষিকায়। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে তাঁর রাসুলের হিজরত সংঘটিত না হলে তারা হয়তো এই অন্তর্ঘাতী যুদ্ধে নিজেরা নিজেদেরকে নিঃশেষ করে তবেই ক্ষান্ত হতো।

অবশেষে আল্লাহ ﷻ তাদের ওপর দয়া করেছেন। তিনি তাঁর রাসুলকে তাদের মাটিতে হিজরত করিয়েছেন। এই হিজরতের মাধ্যমে তারা নিজেদের মধ্যকার সংঘাত ভুলে পরস্পরকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে জড়িয়ে আপন করে নিতে সক্ষম হয়েছিল। নবিজির হিজরতের পর থেকে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ, সম্প্রীতি আর ভালোবাসার মখমল চাদরে রঙিন হয়ে ওঠে গোটা মদিনা।

রাসুলের অন্তরে মদিনার জন্য অসামান্য ভালোবাসা ও সম্মানের জায়গা সৃষ্টি হয়েছিল। রাসুল ﷺ যা ভালোবাসেন, সেগুলোর প্রতি ভালোবাসা লালন করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানি দায়িত্ব। তাই দেখা যায়—আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসার কারণে এবং রাসুলের সুন্নতের অনুসরণ করে সকল মুসলমান

মদিনার প্রতি এক অনন্য আন্তরিক ভালোবাসা লালন করে থাকে। ইমাম বুখারি ﵀ তার *আত-তারিখুল কাবির* গ্রন্থে আল্লাহর রাসুলের এই বাণীটি উল্লেখ করেছেন, 'কেউ একবার 'ইয়াসরিব' শব্দ ব্যবহার করলে, সে যেন দশবার 'মদিনা' শব্দ ব্যবহার করে।' সাহাবি আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

«لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِى هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الأَقْصَى.»

'তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশে সফর করা যাবে না। আমার এই মসজিদ (মসজিদে নববি), মসজিদে হারাম (কাবা) এবং মসজিদে আকসা।'

ইমাম মুসলিম ﵀ উল্লিখিত হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। হাদিসের মর্মার্থ হলো—ইবাদত মনে করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে এবং আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশের জন্য উক্ত তিন মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো মসজিদ, বা আর কোনো অঞ্চলে সফর করা যাবে না। কারণ পৃথিবীর সকল অঞ্চলের চেয়ে উক্ত তিন জায়গাই সবচেয়ে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ।

*হাশিয়াতুস সিন্দি*তে *সুনানু ইবনু মাজাহ-এর* لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ 'সফর করা যাবে না' বক্তব্যের ব্যাখ্যায় দুটি বিশ্লেষণ উল্লেখ করা হয়েছে—

১. এখানে 'নফি' অর্থাৎ না-বাচক শব্দ ব্যবহার করে মূলত 'নাহি' অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে;

২. এখানে সরাসরি 'নাহি' অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা আরোপমূলক শব্দ হিসেবে বিবেচনারও সুযোগ রয়েছে।

*হাশিয়াতুস সিন্দি*র বক্তব্য অনুযায়ী—شَدُّ الرِّحَالُ-এর মূল অর্থ 'সফরের সামানা প্রস্তুত করা'। তবে এখানে রূপক অর্থে সফর করার কথাই বোঝানো হয়েছে। মূল মর্মকথা হলো—(ইবাদতের পুণ্যভূমি বিবেচনা করে বরকত ও অধিক সওয়াব অর্জনের আশায়) উক্ত তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে সফর করা যাবে না; তবে ইলম অর্জন, আলেম ও নেককার মানুষের সান্নিধ্য গ্রহণ এবং বাণিজ্যিক সফর ইত্যাদি উক্ত নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। তদ্রূপ সফর ছাড়া অন্য কোনো মসজিদ পরিদর্শন করা, যেমন: মদিনাবাসীর জন্য মসজিদে কুবা দর্শন করাও উক্ত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহই এই বিষয়ে সর্বাধিক অবগত।

সবুজ গম্বুজসহ মসজিদে নববীর একটি চিত্র

মসজিদে নববীর রাতের দৃশ্য

মুকাররামা থেকে উত্তরে এর দূরত্ব প্রায় ৪২০ কিলোমিটার। সমুদ্র উপকূল থেকে সরলরেখায় এর দূরত্ব ১৫০ কিলোমিটার। মদিনার সবচেয়ে নিকটবর্তী বন্দর হলো দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ইয়ানবু (ইয়ানবু আল-বাহর) বন্দর, এর দূরত্ব ২২০ কিলোমিটার। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদ থেকে মদিনার দূরত্ব ৯৮০ কিলোমিটার।

ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী মদিনার প্রাচীন বৃহদাংশ—যেখানে 'আল-মাদিনাহ আল-কাদিমাহ' গড়ে উঠেছে, তা দক্ষিণ দিকে প্রসারিত একটি চতুর্ভুজ অববাহিকায় অবস্থিত—যার পূর্ব-পশ্চিম এবং দক্ষিণ দিক কৃষ্ণধূসর আগ্নেয় শিলা (Basalt rock) দ্বারা বেষ্টিত। এ ছাড়াও উক্ত চতুর্ভুজ অববাহিকার চারদিকের ভূতাত্ত্বিক গঠনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট রয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে ক্যামব্রিয়ান যুগ-পূর্ব রায়োলাইট শিলা (Rhyolite rock)। কখনো কখনো এই শিলাগুলো আগ্নেয়গিরির লাভা, ছিদ্রযুক্ত আগ্নেয় শিলা (Porous volcanic rock) এবং পাললিক শিলার (Sedimentary rock) সাথে মিশ্রিত হয়। এ ছাড়া চতুর্ভুজ অববাহিকার চারপাশে ক্লোরাইট শিস্ট (Chlorite schist) শিলাও পাওয়া যায়।

মদিনার চতুর্ভুজ গঠন মূলত নুড়ি, বালু, পলি এবং কাদামাটি বা শুষ্ক মাটি মিলে তৈরি হয়, যা মূলত প্রাক-ক্যামব্রিয়ানের গঠন এবং প্রাচীন আগ্নেয়গিরির গঠন থেকে উপত্যকার দিকে পরিবাহিত প্রস্তরখণ্ড থেকে উদ্ভূত। বিভিন্ন অঞ্চলে এসব ভূতাত্ত্বিক গঠন চুনাপাথরের ওপরও পাওয়া যায়, স্থানীয় ভাষায় যা 'জাসসাহ' নামেও পরিচিত।

মদিনার পশ্চিম অঞ্চলে অর্ধবৃত্তাকারের অনেক ফাটলও পাওয়া যায়। এ ফাটলগুলোর দিক ও ঢাল পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখী। মদিনার উত্তরে রয়েছে বালি মিশ্রিত এবং কাদামাটি যুক্ত লবণাক্ত সমতল ভূমি, যা কৃষিকাজের জন্য একদম অনুপযুক্ত।

মদিনার পশ্চিমে এবং উহুদ পাহাড়ের উত্তরে আছে প্রাচীন অ্যান্ডিসাইট (Andesite) শিলা। মদিনার দক্ষিণে শেষপ্রান্তে পাওয়া যায় ব্যাসল্ট ও অ্যান্ডিসাইট শিলার তৃতীয় ও চতুর্থ পর্যায়ের গঠন। এসব গঠন 'হাররাহ রাহাত' অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে এবং উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিম দিকের চতুর্ভুজ অববাহিকা জুড়ে বিস্তৃত। উল্লেখ্য, এ ক্ষেত্রে পশ্চিম দিক বা 'প্রস্তরময় পশ্চিম ভূমি' পূর্ব দিক বা 'প্রস্তরময় পূর্ব ভূমির' চেয়ে সংকীর্ণ, যা উত্তর সমভূমির আরও পূর্ব দিকে সমান্তরালভাবে প্রসারিত।

মনে করা হয়, মদিনায় প্রবাহিত আগ্নেয়গিরির সবচেয়ে সাম্প্রতিক ঢল নেমেছিল সপ্তম হিজরিতে। এই ঢলগুলো সাদা এবং হলুদ কাদামাটির সাথে মিশ্রিত। মদিনার দক্ষিণে কিছু এলাকায় ২০০ মিটার পর্যন্ত গভীর ব্যাসল্টের পুরু স্তরও রয়েছে। এবং এর অনেক জায়গায় ব্যাসল্ট সদৃশ ধূসর-হরিৎ মাটিও পাওয়া যায়।

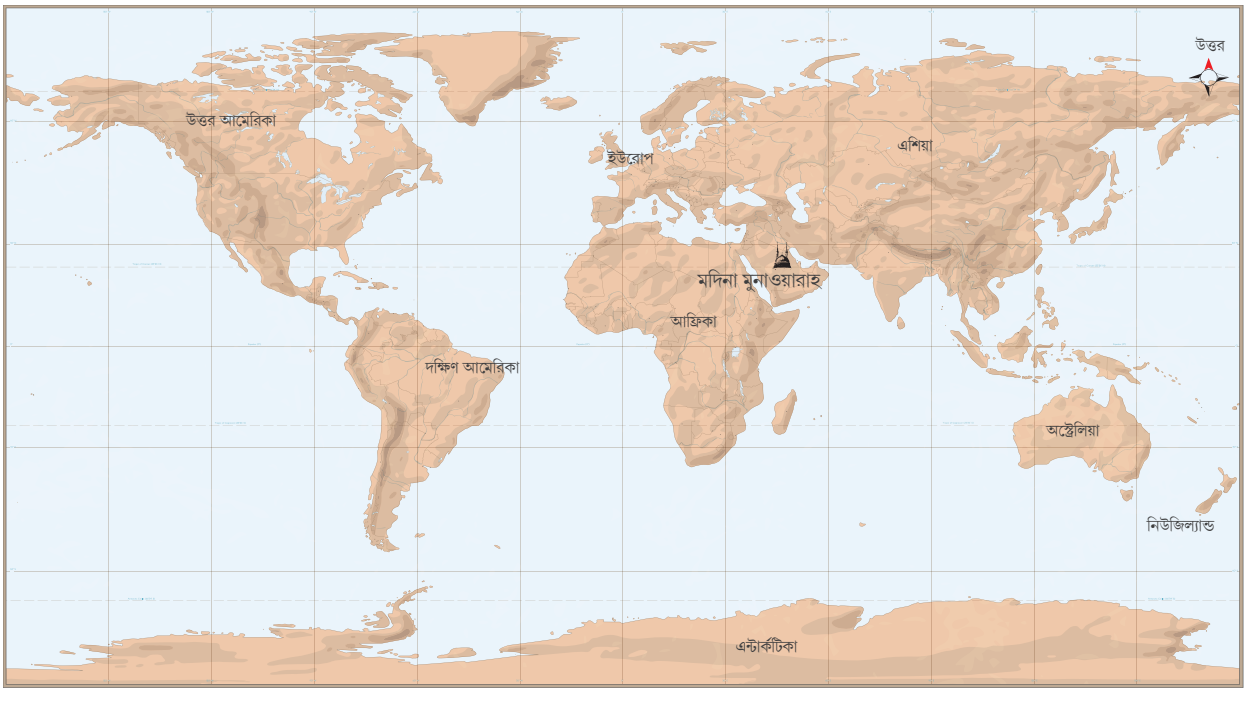

পৃথিবীর মানচিত্রে এক টুকরো মদিনা

তাপমাত্রা: মদিনার জলবায়ু সাধারণত শুষ্ক থাকে। গ্রীষ্মকালে মদিনার সর্বোচ্চ গড় তাপমাত্রা থাকে ৩০ থেকে ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং শীতকালে গড় তাপমাত্রা থাকে ১০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মদিনায় রেকর্ড উচ্চ তাপমাত্রা বিরাজ করে জুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

বৃষ্টিপাত: সর্বাধিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকে নভেম্বর, জানুয়ারি, মার্চ ও এপ্রিলে। বছরে বৃষ্টিপাতের সর্বোচ্চ গড় এপ্রিল মাসে ২.১২ মি.মি. পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। এবং বছরে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে ৯৪.৩ মি.মি.-এর আশপাশে। আর গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয়ে থাকে কালেভদ্রে।

আর্দ্রতা: বছরের অধিকাংশ সময় মদিনার আর্দ্রতা নিম্নমুখী থাকে, এবং তা গড়ে ২২%। বৃষ্টিপাতের সময় তা হয়ে দাঁড়ায় ৩৫%। গ্রীষ্মকালে তা নেমে আসে ১৪%-এর আশপাশে।

বায়ুপ্রবাহ: মদিনায় সাধারণত দক্ষিণ-পশ্চিমের বাতাস প্রবাহিত হয় এবং এই বাতাস অধিকাংশ সময় উষ্ণ ও শুষ্ক হয়ে থাকে। বাতাসের বেগ থাকে ঘণ্টায় ৫.৮ নটিক্যাল মাইল, যা মৃদু বাতাস হিসেবে বিবেচিত।

মসজিদে নববীর চারপাশের এরিয়াকে মারকাজিয়া বলা হয়ে থাকে। মারকাজিয়ার আবাসিক হোটেলগুলো দেখা যাচ্ছে

নবি-যুগের মসজিদে নববির হাতে আঁকা কাল্পনিক একটি ছবি।
আল মাদিনাহ আল-মুনাওয়ারাহ তারিখ ওয়া মাআলিম; মারকাযু বুহূসি ও দিরাসাতিল মাদিনাতিল মুনাওয়ারাহ, পৃ. ১২-১৩

রাসুলের হিজরতের আগে মদিনার নাম ছিল ইয়াসরিব। ইয়াসরিব একজন ব্যক্তির নাম। মহাপ্লাবনের পর তিনিই প্রথম এই শহরে বসবাস শুরু করেছিলেন। এর নামকরণ প্রসঙ্গে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। তবে এ কথা সুবিদিত যে, ইসলামের সূচনাকালে এর নাম ছিল ইয়াসরিব। তারপর রাসুলের বরকতময় হিজরতের পর এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'মাদিনাতুন নাবি' বা নবিজির শহর।

মদিনার গুরুত্ব:

মদিনা হলো দারুল ঈমান। ঈমানের বাতিঘর। হিদায়াতের ঠিকানা। ইসলামের প্রথম রাজধানী। মসজিদে নববি এবং রাসুলের রওজার মাতৃকোল। এর প্রসিদ্ধ নাম—মদিনা। নামের সাথে কোনো কিছুর যুক্তকরণ বা সম্পৃক্তকরণ ছাড়াই বলা হয়—মদিনা। কুরআনুল কারিমে চার জায়গায় এই নামটির উল্লেখ রয়েছে; এমনিভাবে এর উল্লেখ রয়েছে হাদিসেও। নবিজি ﷺ সেখানে বসবাস করতেন, তাই মদিনা শব্দের সঙ্গে 'নববি' শব্দ যুক্ত করা হয়। আল্লাহর নুর এবং রাসুলের হিদায়াতের মাধ্যমে আলোকিত হওয়ায় মদিনা শব্দের সঙ্গে 'মুনাওয়ারাহ' (আলোকিত) শব্দটিও যুক্ত করা হয়।

রাসুলের হৃদয়জুড়ানো ভালোবাসায় সিক্ত ছিল মদিনার মাটি। তাঁর অন্তরে মদিনার অবস্থান ছিল মর্যাদায় সমুচ্চ। তাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবেসে এবং রাসুলের পবিত্র সুন্নাহর অনুসরণ করে সাহাবাগণও মদিনাকে মন থেকে ভালোবাসতেন। কারণ, রাসুল ﷺ যা ভালোবাসেন, সেটিকে ভালোবাসা বান্দার ওপর আল্লাহ ﷻ আবশ্যক করেছেন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ﷺ তার *মুসনাদ*-এ উল্লেখ করেন—রাসুল ﷺ বলেছেন, 'যে মদিনাকে ইয়াসরিব বলে, সে যেন ইস্তিগফার করে। এটি তাবাহ (পবিত্র), এটি তাবাহ (পবিত্র)।'

ইমাম বুখারি ﷺ তার *আত-তারিখুল কাবির* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'কেউ একবার 'ইয়াসরিব' শব্দ বললে সে যেন দশবার 'মদিনা' শব্দ বলে।' এই কথার মাধ্যমে রাসুল ﷺ বুঝিয়েছেন—ইয়াসরিব শব্দটি ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলার অর্থ প্রদান করে। এই শব্দটি ইহুদিদের যুগে প্রচলন পেয়েছে। আল্লাহ ﷻ হেফাজত করুন।

তৃতীয় পর্ব

হজ ও উমরাহর

মাসায়েল, নিয়মকানুন ও বিধিবিধান

গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিভাষার অর্থ ও ব্যখ্যা

পরিভাষা	পরিচয়
المسجد الحرام মাসজিদে হারাম	কাবা শরিফ, কাবার চত্বর, কাবা বেষ্টনকারী মসজিদ এবং তার অনুগামী চারদিকের সীমানা মিলে মসজিদে হারাম। গোটা মক্কা এবং মক্কার অন্যান্য মসজিদ মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাওয়াফ এবং সালাত কাবার যত নিকটবর্তী হয়, সওয়াব তত বেশি হয়। মসজিদে হারামের বাইরে তাওয়াফ করা সঠিক নয়।
الإحرام ইহরাম	ইহরাম শব্দের শাব্দিক অর্থ—নিষেধ, বারণ, প্রতিরোধ। উদাহরণস্বরূপ: (أحرم الرجل) লোকটি ইহরাম করেছে, অর্থাৎ লোকটি নিষিদ্ধ মাসে প্রবেশ করেছে। লোকটি হজ এবং উমরার ইহরাম করেছে, অর্থাৎ সে ইহরামের কাপড় পরে ও নিয়ত করে মুহরিম হয়েছে, অর্থাৎ বারণকারী বা নিষেধকারী হয়েছে। ইহরাম পরিধানকারীকে মুহরিম বলার কারণ হলো—সে নিজের জন্য শিকার করা, সহবাস করা এবং এ জাতীয় আরও বেশকিছু বৈধ কাজকে আপাতত অবৈধ করে নিয়েছে। ইহরামের শরয়ি অর্থ হলো হজ ও উমরাহর কার্যক্রমে প্রবেশের নিয়ত করা।
فرض ফরজ	শাব্দিকভাবে ফরজ বলা হয় কোনো কিছুর মূল ভিত্তিসমূহের একককে। হজ বা উমরাহর ক্ষেত্রে ফরজ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো—যে কাজ ছুটে গেলে হজ বা উমরাহও ছুটে যায়। যেমন: ইহরাম বাঁধা, তাওয়াফ, আরাফায় অবস্থান করা ইত্যাদি। কেউ একটি ফরজ ছেড়ে দিলে তার হজ বা উমরাহ বাতিল হয়ে যাবে (তবে সময়মতো নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবিধান করতে পারলে তা আবার সম্পন্ন হয়ে যাবে)।
الواجب ওয়াজিব	যে আমলগুলো একজন হাজির জন্য পালন করা আবশ্যক এবং কোনো কারণে যেগুলো ছুটে গেলে দম প্রদানের মাধ্যমে হজ সহিহ করতে হবে, সেগুলোকে ওয়াজিব বলে। যেমন: সাফা-মারওয়ায় সায়ি করা, মুজদালিফায় অবস্থান করা, জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা, চুল কাটা, বিদায়ি তাওয়াফ করা ইত্যাদি।
محظورات বর্জনীয়	যে সমস্ত কাজ ইহরাম অবস্থায় বর্জন করা আবশ্যক, সেগুলোকে মাহযুরাত বলা হয়। যে ব্যক্তি তা বর্জন করবে, সে সওয়াব পাবে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে যে তা করবে, সে গুনাহগার হবে। আর সেসব নিষিদ্ধ কাজের অন্তর্ভুক্ত হলো—সুগন্ধি ব্যবহার করা, মাথা ঢেকে রাখা ইত্যাদি। যদি এসব কাজ সে ভুলে করে থাকে, তাহলে ফিদয়া আসবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রয়োজনবশত করলেও ফিদয়া দিতে হবে।
السنة أو المستحب সুন্নত বা মুস্তাহাব	হজ এবং উমরাহর এমন কাজ, যা করলে সওয়াব পাবে, না করলে গুনাহ নেই, এবং ফিদয়া বা কাফফারাও দিতে হয় না।

الفدية ফিদয়া	এক্ষেত্রে তিনটি শব্দ রয়েছে: الفدية، الفدى، الفداء। প্রতিটি শব্দের প্রথম অক্ষর 'ফা' যের-বিশিষ্ট হবে। প্রতিটি শব্দের অর্থ একই—কোনো কাজের দায়ে মাল-সম্পদ পেশ করা। শরয়ি পরিভাষায় এর অর্থ হলো—ইহরামকালীন নিষিদ্ধ কাজ করার দায়ে আল্লাহর সমীপে প্রাণী উৎসর্গ করা। যেমন: হজের সময় সেলাইকৃত কাপড় পরা, সুগন্ধি মাখা ইত্যাদি।
الكفارة কাফফারা	কাফফারা হলো, যা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত ঘটায়। ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করে। কাফফারা আদায় হয় 'বাদানাহ' তথা উট, গরু বা ছাগল জবাই অথবা এর পরিবর্তে রোজা রাখা কিংবা মিসকিনদের খাদ্য প্রদানের মাধ্যমে।
أيام التشريق আইয়ামুত তাশরীক	'ইয়াওমুন নাহার' তথা ঈদের পরবর্তী তিন দিনকে আইয়ামুত তাশরিক বলে। কারও মিনায় অবস্থান সম্পন্ন হয়ে গেলে তার জন্য দুই দিন পর হজের কার্যক্রম তাড়াতাড়ি সম্পন্ন করা বৈধ। সেক্ষেত্রে মিনার রাত থেকে দুই দিনই যথেষ্ট হবে। আইয়ামুত তাশরিকের দিনসমূহে রোজা রাখা নিষেধ।
الطواف তাওয়াফ	তাওয়াফ শব্দের শাব্দিক অর্থ—কোনো কিছুর চারপাশে প্রদক্ষিণ করা। এ জন্য যেই ব্যক্তি প্রহরার উদ্দেশ্যে ঘরের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে, তাকে তায়েফ বলা হয়। শরয়ি পরিভাষায় তাওয়াফ হলো—উল্লেখযোগ্য বিরতি না দিয়ে ধারাবাহিকভাবে কাবার চারপাশে সাতবার প্রদক্ষিণ করা।
السعي সায়ি	শরিয়তের পরিভাষায় সায়ি হলো, হজ বা উমরাহর আনুষ্ঠানিক তাওয়াফ শেষে সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মাঝে সাতবার আসা-যাওয়া করা।
الهدي হাদি	كل ما يهدى الى الحرم যা কিছু হারামের দিকে পাঠানো হয়, তা-ই হাদি; প্রাণী বা খাদ্য বা কাপড়। এখানে উদ্দেশ্য হলো, চতুষ্পদ গৃহপালিত প্রাণী হারামের দিকে প্রেরণ করা। - *শায়েখ সালেহ উসাইমিন*
الدم দম	প্রাণী জবাই করা, এখানে উদ্দেশ্য হলো হজের জরিমানাস্বরূপ যে প্রাণী জবাই করা হয়। - *শায়েখ সালেহ উসাইমিন*
المبيت মাবিত	মুজদালিফা বা মিনায় অর্ধরাত পরিমাণ অবস্থান করা। এক্ষেত্রে ঘুমানো বা শয়ন করা শর্ত নয়; বরং সেখানে উপস্থিত হওয়াই যথেষ্ট।
الحج الاكبر والاصغر বড় হজ ও ছোট হজ	হাফেজ ইবনু হাজার বলেন, জমহুরের মতে হজ হলো বড় হজ, আর উমরাহ হলো ছোট হজ। কেউ বলেন, ছোট হজ হলো আরাফার দিন, আর বড় হজ হলো কুরবানির দিন।
يوم التروية তারবিয়াহ	তারবিয়াহর দিন বলা হয় জিলহজ মাসের অষ্টম দিনকে। এই দিনে হাজিগণ রাতযাপনের জন্য মিনার উদ্দেশে রওনা হন। লোকজন মিনা ও আরাফার উদ্দেশে রওনার প্রস্তুতি হিসেবে এই দিনে পানি সংগ্রহ করে, যার মাধ্যমে তারা পরিতৃপ্ত হয়, তাই দিনটিকে 'ইয়াওমুত তারবিয়াহ' বা তারবিয়াহর দিন বলা হয়।
يوم القرّ ইয়াওমুল কার্‌র	ইয়াওমুল কার্‌র: এ শব্দটি আরবি 'কার্‌র' শব্দমূল থেকে নির্গত। আর 'কার্‌র' অর্থ হলো স্থিতির ভূমি। ইয়াওমুল ক্বার বা 'কার্‌র দিবস' বলা হয়—ইয়াওমুন নাহার তথা ঈদের দিনের পরবর্তী দিনকে। আর সেটি হলো জিলহজের ১১ তারিখ। এ দিনটির নাম ইয়াওমুল কার্‌র হওয়ার কারণ হলো—হাজিগণ সেখানে গিয়ে অবস্থান তথা 'ইকরার' করেন; তারা সেখানে (মিনা) গিয়ে অবস্থান করেন কঙ্কর নিক্ষেপের কার্যক্রম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে।

হজের প্রথম কাজ (‘ইয়াওমুত তারবিয়াহ’ বা তারবিয়ার দিন, ৮ জিলহজ)

এই দিনকে ‘তারবিয়ার দিন’ বলা হয়। কারণ, ‘তারবিয়াহ’ শব্দের অর্থমূলে সিক্তকরণ, তৃষ্ণা নিবারণ এবং পানি সরবরাহকরণের অর্থ রয়েছে। এই দিনে হজ প্রত্যাশীগণ পরবর্তী দিনগুলোর জন্য পানি সঞ্চয় করত এবং পরিতৃপ্ত হতো, তাই এই দিনকে ‘ইয়াওমুত তারবিয়াহ’ তথা ‘তারবিয়ার দিন’ বলা হয়।

অনেকে বলেন, ‘তারবিয়াহ’ শব্দের অর্থমূলে যে চিন্তা করা ও ধ্যান করার অর্থ আছে, তার বিবেচনায় এই দিনকে ‘ইয়াওমুত তারবিয়াহ’ বলা হয়। কারণ, ইবরাহিম ﷺ যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, সে স্বপ্ন নিয়ে এই দিনেই তিনি গভীর চিন্তায় ডুবেছিলেন। পরবর্তী নয় তারিখে ছেলেকে স্বপ্নের কথা জানিয়েছিলেন এবং দশ তারিখে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন (*আল-কামুস আল-মুহিত*)।

ইয়াজ বলেন, তখনকার সময়ে আরাফায় পানি পাওয়া যেত না। তাই হাজিরা মক্কা থেকে আরাফায় পানি নিয়ে যেত এবং সেই লক্ষ্যে এই দিনে নিজ নিজ পাত্রে পানি সঞ্চয় করত। তাই এই দিনকে ‘ইয়াওমুত তারবিয়াহ’ বা তারবিয়ার দিন বলা হয় (*মুজামুল বুলদান*)।

তারবিয়ার দিনের করণীয়—

১. জিলহজের ৮ তারিখ, অর্থাৎ, তারবিয়ার দিনে যারা তামাত্তু হজের নিয়তে এসেছে এবং প্রথমে উমরাহ করে হালাল হয়েছে, তারা এবং মক্কার হজপ্রত্যাশীরা এই দিনের সকালে নিজ নিজ অবস্থান থেকে হজের নিয়তে ইহরাম বাঁধবে। আর যারা কিরান এবং ইফরাদ হজের নিয়তে ইহরাম পরেছিল, তারা আগের ইহরামেই অব্যাহত থাকবে।

২. মিকাত থেকে ইহরাম পরার সময় যে-কাজগুলো করেছিল, সেগুলো করা; অর্থাৎ গোসল করা, পরিচ্ছন্ন হওয়া, সুগন্ধি মাখা ইত্যাদি করা মুস্তাহাব।

৩. মনে মনে হজের নিয়ত করবে এবং মুখে উচ্চারণ করবে—‘লাব্বাইকা হাজ্জান’ আমি হজের জন্য উপস্থিত। যদি কোনো বাধাদানকারীর বাধার ফলে হজের কার্যক্রম সম্পূর্ণ

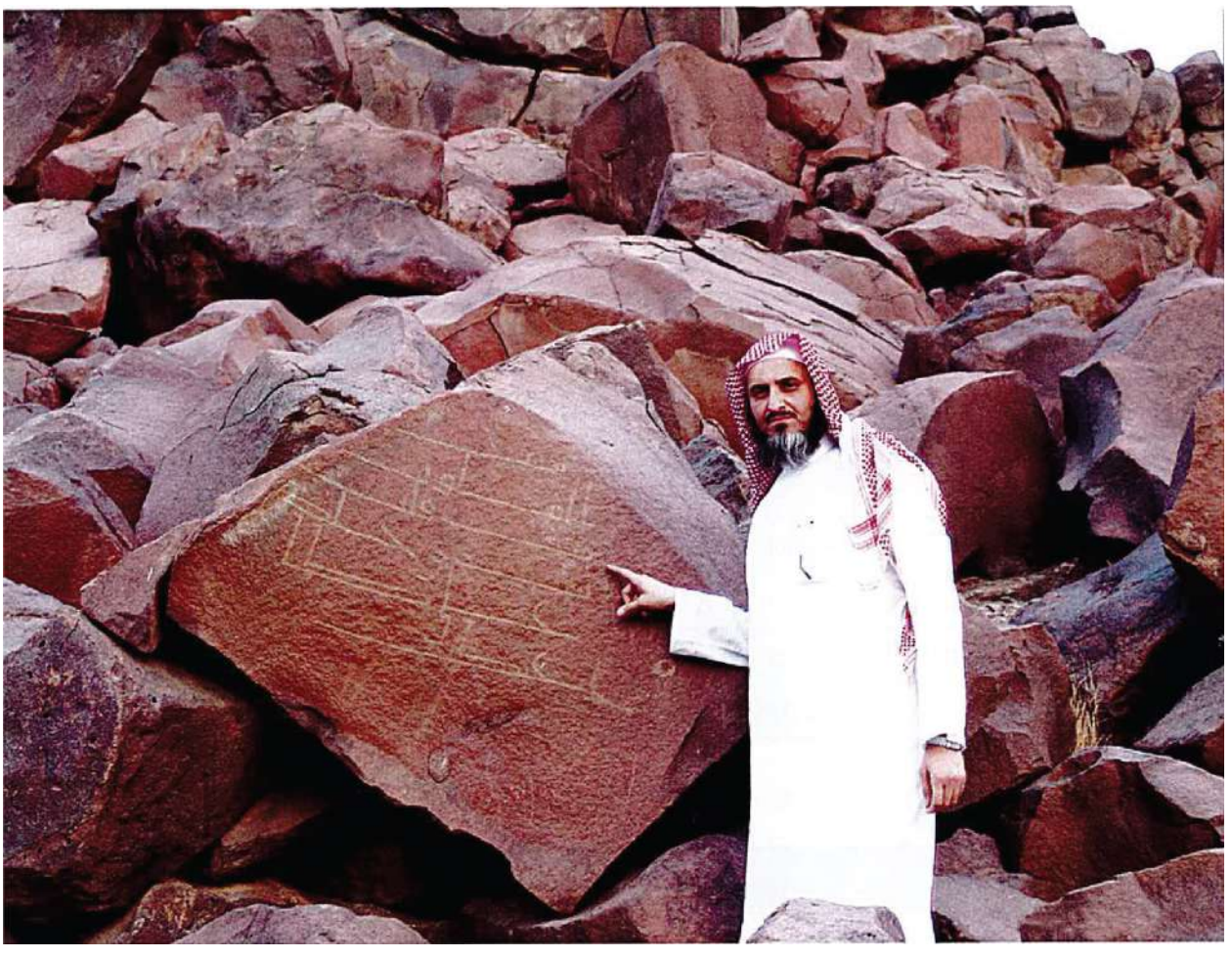

বিশ্বকোষের লেখক ও ডিজাইনারের জীবন-পরিচিতি

সামি ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু সালিহ আল-মাঘলুস

মাঘলুস পরিবার আল-আতা' (আল-মিরদান) গোত্রের অন্তর্গত,
যা আবদা থেকে রাবিয়াহ থেকে, তায়ি শুম্মার গোত্রের অংশ।

- তিনি ১৩৮২ হিজরিতে আল-মুবাররাজ, আল-আহসা গভর্নরেটে জন্মগ্রহণ করেন।
- কিং ফয়সাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৪০৮ হিজরিতে ইতিহাসকে মেজর এবং ভূগোলকে মাইনর রেখে অনার্স করেন।
- ১৪১৯ হিজরি থেকে লেখার সময়ের আগ পর্যন্ত (২৫-১১-১৪৩৫ হিজরি) তিনি জামিউল মাঘলুস আল-মুবাররাজের ইমাম ও খতিব ছিলেন। অল্প বয়সেই তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন।
- আল-কাসিম অঞ্চলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যাপক পাঠ্যক্রম প্রকল্পের পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুতকারী দলের সদস্য এবং পাঠ্যক্রম তত্ত্বাবধায়ক। তিনি সেই প্রকল্পের কারিগরি সহায়ক এবং একাডেমিক ডিজাইনের সুপারভাইজার ছিলেন।
- দারাতুল মালিক আবদুল আজিজের শিক্ষাগত মানচিত্র সংকলনকারী দলের সদস্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি উক্ত প্রকল্পের ঐতিহাসিক দিকটির তত্ত্বাবধান করেন।
- তিনি রিয়াদের মাকতাবাতুল ওবেকানের স্কুল-মানচিত্র সংকলনকারী দলের সদস্য।

- মদিনাতুল মুনাওয়ারাহ রিসার্চ এন্ড স্টাডিজ সেন্টারে আহজাব যুদ্ধের ঘটনা যাচাইকরণের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।
- ১৪২৯ হিজরিতে ইসলাম প্রচারের একটি ঐতিহাসিক মানচিত্র প্রস্তুত করার জন্য মিনিস্ট্রি অব ইসলামিক অ্যাফেয়ার এন্ড আওকাফ কর্তৃক নিযুক্ত হন।
- ১৪৩১ হিজরিতে পাঠ্যক্রম উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য শিক্ষামূলক পণ্যগুলোতে পর্যটন এবং ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে তথ্যসহ একটি নথি প্রস্তুত করার জন্য সৌদি কমিশন ফর ট্যুরিজম অ্যান্ড ন্যাশনাল হেরিটেজ কর্তৃক নিযুক্ত হন।
- ১৪৩১ হিজরিতে পর্যটনশিক্ষার জন্য একটি মানচিত্র তৈরির প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত হন।
- লেখালেখি ও পাঠ্যপুস্তক ডিজাইনের ক্ষেত্রে তাকে বেশ কয়েকটি শিক্ষাগত একাডেমিক সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। তিনি কার্টোগ্রাফিক্যাল এবং মাল্টিমিডিয়া ডিজাইন সফটওয়্যারে দক্ষ।
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইসলামিক দেশগুলিতে আয়োজিত শহুরে ঐতিহ্যের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তাকে মহামান্য প্রিন্স ফয়সাল ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ আলে সৌদ (শিক্ষামন্ত্রী) কর্তৃক নিযুক্ত করা হয় 'পাঠ্যসূচিতে আমাদের ঐতিহ্যের বোঝাপড়া প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা' শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র প্রস্তুত ও উপস্থাপন করার জন্য।
- মুদ্রাবিদ্যায় (মুদ্রার অধ্যয়ন) তার বিশেষ আগ্রহ রয়েছে।
- তিনি স্যাটেলাইট টিভি-শোতে, বিশেষ করে, সৌদি চ্যানেলের অসংখ্য আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।